দেশপ্রেমিকদের প্রতি

(একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা)

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

© ২০১৩ আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়)

কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস : আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ আনন্দনগর ,

পোঃ- বাগলতা ,

জেলা — পুরুলিয়া , পশ্চিমবঙ্গ

যোগাযোগ অফিসঃ ৫২৭ , ভি . আই . পি . নগর ; কলকাতা - ৭০০ ১০০

প্রথম প্রকাশ : ১ লা জানুয়ারী , ১৯৬০

দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ , ১৯৮২

তৃতীয় সংস্করণ : অক্টোবর , ১৯৮৭

চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর , ১৯৯০

পঞ্চম সংস্করণ : আনন্দ – পূর্ণিমা , ১৯৯৮

ষষ্ঠ সংস্করণ : আনন্দ – পূর্ণিমা , ২০১১

প্রকাশক : আচার্য সুগতানন্দ অবধূত (কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব) আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগ 527 ভি . আই . পি . নগর কলকাতা -৭০০ ১০০

মুদ্রাকর : আচার্য সর্বজয়ানন্দ অবধূত আনন্দ প্রিন্টার্স ৩/১ সি, মোহনবাগান লেন কোলকাতা – ৭০০০০৪

ISBN 978-81-7252-281-0

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

চরম নির্দেশ

“ যে দু’ৰেলা নিয়মিতরূপে সাধনা করে , মৃত্যুকালে পরমপুরুষের কথা তার মনে জাগৰেই জাগৰে ও মুক্তি সে পাৰেই পাৰে । তাই প্রতিটি আনন্দমার্গীকে দু’ৰেলা সাধনা করতেই হবে – ইহাই পরম পুরুষের নির্দেশ। যম–নিয়ম ব্যতিরেকে সাধনা হয় না । তাই যম–নিয়ম মানাও পরম পুরুষেরই নির্দেশ । এই নির্দেশ অমান্য করার অর্থ হ’ল কোটি কোটি বৎসর পশুজীবনের ক্লেশে দগ্ধ হওয়া । কোন মানুষকেই যাতে সেই ক্লেশে দগ্ধ হতে না হয় , সবাই যাতে পরম পুরুষের স্নেহচ্ছায়ায় এসে শাশ্বতী শান্তি লাভ করে, তজ্জন্য সকল মানুষকে আনন্দমার্গের কল্যাণের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা প্রতিটি আনন্দমার্গীর অবশ্য করণীয়। অন্যকে সৎপথের নির্দেশনা দেওয়া সাধনারই অঙ্গ।”

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল :

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	am	ah

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ka	kha	ga	gha	uṋa	ca	cha	ja	jha	iṋa

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
t́a	t́ha	d́a	d́ha	ńa	ta	tha	da	dha	na

প ফ ব ভ ম

प फ ब भ म

Pa pha ba bha ma

য র ল ব

य र ल व

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

श ष स ह क्ष

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোऽহং

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

aṋ jiṋa rśi cháya jiṋána saḿskrta tato’haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ n
ń ṋ o p r s ś t t́ u ú v y

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f , q , qh , z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে , সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়। প্রয়োজন বোধে ও অসংস্কৃত শব্দ লিখবার জন্যে ŕ ও ŕha ব্যবহার করা যেতে পারে।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ

क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ल़	त्	अँ
ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
qua	qhua	za	ŕa	ŕha	fa	ya	lra	t	aṋ

উৎসর্গ

****

সুধারঞ্জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

****

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

১৯৬০ সালের ১ লা জানুয়ারী , বিহারের জামালপুরে অনুষ্ঠিত প্রগতিশীল সাহিত্যিক সম্মেলনে ইতিহাস - শাখার সভাপতির অভিভাষণ

সূচীপত্র

নেশন জিনিসটা হচ্ছে

যদিও ইংরেজরা ইচ্ছাকৃতভাবে চায়নি , তবুও তাদেরই চেষ্টাতেই ভারতীয় নেশন গড়ে উঠল

কোথায় ভুল হয়েছিল :

এখন কী করা উচিত :

দেশপ্রেমিকদের প্রতি

‘ নেশন ’ শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা কী —এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। কেউ বলেন , যে মানব - গোষ্ঠী একই রাষ্ট্রের বাসিন্দা তারাই একটা নেশন। অবশ্য রাষ্ট্র বা দেশকে সমার্থক ধরলেও ‘ নেশন ’ নিয়ে বিতর্ক এখানেই শেষ হয় না। কেউ কেউ বলেন , ‘ নেশন ' গড়ে ওঠে সমভাষিতার ওপরে , কেউ বা বলেন এক ধরনের আচার - ব্যবহার , একই জীবনযাত্রা প্রণালী , একই ঐতিহ্য , একই রক্তধারা , একই ধর্মমত প্রভৃতির একটি বা একাধিক তত্ত্বের মিশ্রণে গড়ে ওঠে ‘ নেশন ' ।

বাস্তবের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিন্তু এই তত্ত্বগুলোর কোনটাকেই খুব বেশী গুরুত্ব দিতে পারছি না। ভারতীয় , পাকিস্তানী ও বার্মিজেরা একসময়ে একই দেশ তথা একই রাষ্ট্র ভারতবর্ষের বাসিন্দা ছিল কিন্তু কই , তারা তো একটা নেশন গড়ে তুলতে পারেনি ! সমভাষিতা নেশন গড়ার অত্যাবশ্যক অঙ্গ নয়। তা যদি হত তবে আমেরিকার ইংরেজীভাষীরা ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের বাইরে গিয়ে ফরাসী ও স্পেনিশভাষীদের সহযোগিতায় স্বতন্ত্র মার্কিন সাম্রাজ্য গড়ে তুলত না। সমভাষিতাই যদি নেশনের মানদণ্ড হত — তা হলে সুইস নেশন তিন / চার ভাগে ভাগ হয়ে যেত। জার্মান ভাষীরা তাদের নিজেদের অঞ্চলকে সুইৎজারল্যান্ড থেকে পৃথক করে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করতে চাইত ও নিজেদের জার্মান বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব বোধ করত। অনুরূপভাবে , ফরাসী ও ইতালীয়ান ভাষী অঞ্চলও ফ্রান্স ও ইতালীর অন্তর্ভুক্ত হতে চাইত কিন্তু তাও হয়নি। জার্মান , ফ্রেঞ্চ , ইতালিয়ান ও রোমাঁশ — চারটি রাষ্ট্রভাষা নিয়ে সুইস একটি নেশন। বেলজিয়ামের ফরাসী - ভাষীরা নিজেদের ফরাসী বলে পরিচয় না দিয়ে বেলজিয়ান নেশন হিসেবে দেখতে চায়। এই সেদিনও দেখেছি , একই বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম বাঙলা ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভারতীয় হিসেবে ও পূর্ব বাঙলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পাকিস্তানী হিসেবে পরিচয় দিতে চেয়েছে। বাঙালী নেশন হিসেবে পরিচয় দিতেও চায়নি। সোহরাওয়ার্দি শরৎ বসুর বাঙালীস্তানের প্রস্তাবকে জনসাধারণ , আমল দিতে চায়নি।

আচার - ব্যবহারের বিচারে স্পেনিশ ও পর্তুগীজ - ভাষীরা অভিন্ন , ভাষাগত ভিন্নতাও নেই বললেই চলে । এমনকি , ইয়ূরোপের পশ্চিমাংশের প্রায় প্রতিটি দেশেরই আচার - ব্যবহার কতকটা একই , তবু তারা এক নেশন নয় । নেশন - প্রেষ্টিজ বাঁচাবার জন্যে অতীতে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি ও খুনোখুনি করেছে । আবার সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের আচার ব্যবহার হওয়া সত্বেও ব্রিটেনের ওয়েলবাসী সম্প্রদায় ব্রিটিশ বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধই করে ।

সমগ্র ইয়ূরোপের জীবনযাত্রা প্রণালী কতকটা একই ধরনের । সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার (ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান সহ) জীবনযাত্রা প্রণালীও একই ধরনের । কিন্তু তাতে করে তো তারা একটা নেশন গড়ে তুলতে পারেনি !

ৰাঙলার অধিবাসীদের ঐতিহ্যধারা একটিই । পঞ্জাবেরও তাই । ইহুদি ও আরবের মুসলমানদের মধ্যে ঐতিহ্যগত পার্থক্য নেই । তবু ৰাঙলার লোকেরা , পঞ্জাবের লোকেরা ও মিলিতভাবে ইহুদি ও আরবের মুসলমানরা কোন নেশন গড়ে তুলতে পারে নি

। অধিকন্তু তাদের মধ্যে ধর্মগত কারণে বহু রক্তপাত ঘটে গেছে ।

রক্তগত বিচারে আইবেরিয়া উপদ্বীপের অধিবাসীরা অভিন্ন । ঠিক তেমনি স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপেরও । তবু তারা বিভিন্ন নেশনে বিভক্ত । রক্তের বন্ধন তাদের এক করতে পারেনি । সুতরাং রক্ত বা ‘ রেস ’ (race) - এর বিচারে নেশনকে দাঁড় করাবার চেষ্টা সব সময়ে কাজ দেবেনা ।

এক ধর্মমতই যদি নেশন গড়ে তুলতে পারত তাহলে বর্তমান পৃথিবীতে ছয় / সাতটির বেশী নেশনের অস্তিত্ব থাকত না । সমগ্র ইয়ূরোপও প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক মোটামুটি দু'টি নেশনে বিভক্ত হয়ে যেত । কিন্তু তাও হয়নি । তবে নেশন গড়ে ওঠে কিসের ভিত্তিতে ? আসলে নেশন গড়বার কাজে দেশ , রাষ্ট্র , ভাষা , ধর্মমত প্রভৃতি তত্ত্বগুলো একেবারেই গৌণ । **আসল নেশন জিনিসটা হচ্ছে ওইগুলির কোন একটি বা একাধিক তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গড়ে ওঠা এক ধরনের চেতনা বা সেন্টিমেন্ট ।** ‘ নেশন ’ জিনিসটার অস্তিত্ব আসলে নিছক সেন্টিমেন্ট - প্রসূত — এর বেশী কোন কিছু নয় ।

এখন দেখা যাক , ভারতবর্ষে এই ধরনের কোন সেন্টিমেন্ট কোন কালে ছিল কি না অর্থাৎ এদেশে কোন কালে নেশন বলে কোন কিছু ছিল কি না ।

সুপ্রাচীন কালে আর্যরা যখন ভারতবর্ষে এসেছিল তখন এদেশের সামাজিক জীবন ছিল একেবারে ছিন্ন - বিচ্ছিন্ন । অষ্ট্রিক , দ্রাবিড় , মঙ্গোলীয় প্রভৃতি শত - সহস্র ছোট - বড় সমাজ নিয়েই তখন ভারতের জনতা । সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত আর্যরা (ককেশীয় আর্য) ভারতবর্ষে এল । সঙ্গে নিয়ে এল তাদের বৈদিক জীবনযাত্রা প্রণালী , বৈদিক ভাষা , রাষ্ট্রনীতি , সমাজনীতি , রণনীতি । ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের জন্যে তারা সাধারণভাবে অবজ্ঞামূলক ‘ অনার্য ’ শব্দটি ব্যবহার করতে লাগল । ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে দু'টি পৃথক মানসিকতায় বিভক্ত হয়ে গেল । একটি বিজয়ী আর্যের মদগর্বী সেন্টিমেন্ট , অপরটি পরাজিত অনার্যের হীনম্মন্যতা - প্রসূত সেন্টিমেন্ট — আর্য ও অনার্য ।

দিন এগিয়ে চলল । অনার্য - সংস্পর্শে এসে আর্যের বৈদিক ভাষার রূপান্তর ঘটল । দেখা দিল বিভিন্ন প্রান্তীয় প্রাকৃত

ভাষাগুলি। আর্যের সঙ্গে অনার্যের রক্তের মিশ্রণ এড়িয়ে চলার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। আর্য শরীরে অনার্যের , অনার্য শরীরে আর্যের রক্ত অনুপ্রবেশ করল। ক্রমশঃ অনার্য জাতি শূদ্র বা চতুর্থ বর্ণরূপে আর্য সমাজে স্থান লাভ করল। আর এই মেলামেশার ফলে ক্রমশঃ আর্যের আর্যত্বের সেন্টিমেন্ট ও অনার্যের সেন্টিমেন্ট দুর্বল হয়ে পড়ল। যে দু'টি প্রধান সেন্টিমেন্টের ফলে আর্‌য ও অনার্য নেশন দু'টির উদ্ভব হয়েছিল সেই দু'টি সেন্টিমেন্টই দুর্বল হয়ে যাওয়ায় দু'টি নেশনের মৃত্যু ঘটল অর্থাৎ দেশ আবার নেশনহীন হয়ে গেল।

(এই নেশন - হীন মাৎস্যন্যায়ের (chaos) যুগেই ভারতবর্ষে দেখা দিল ৰৌদ্ধ বিপ্লব। ৰৌদ্ধ জীবনাদর্শ আবার নূতন করে একদল মানুষকে ঐক্যসূত্রে বাঁধল। একটি নূতন নেশন তারা গড়ে তুলল। গোড়ার দিকে অ - বৌদ্ধরা ছিল ছিন্ন - বিচ্ছিন্ন , তাই তারা নিজেদের নিয়ে কোন নেশন গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু ক্ষমতার মোহে মত্ত হয়ে তথা রাজশক্তির প্ররোচনায় বৌদ্ধরা যখন অ - বৌদ্ধের উপর অবিচার আরম্ভ করল তখন অ - বৌদ্ধের মধ্যে জেগে উঠল এক ৰৌদ্ধ - বিরোধী সেন্টিমেন্ট (

anti - Bud dhist sentiment) । ঠিক যেমনটি জেগেছিল অনার্যের মধ্যে আর্যের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় । ৰৌদ্ধযুগের শেষের দিকে তাই ভারতে দেখা দিয়েছিল মোটামুটি বিচারে দু'টো নেশন । একটি ৰৌদ্ধ সেন্টিমেন্ট , অপরটি গড়ে ওঠা ৰৌদ্ধ - বিরোধী সেন্টিমেন্ট ।

ভিক্ষুদের অধঃপতনের ফলে , মঠের ও সংঘের নানা , গোলযোগে , রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ও সর্বোপরি বৌদ্ধ সমাজে নাম করা দার্শনিক পণ্ডিতের অভাব ঘটায় ও অপরপক্ষে অ - বৌদ্ধদের রাজশক্তির সাহায্য থাকায় ও শংকরাচার্যের মত মহাপণ্ডিত ও মহাতার্কিকের আবির্ভাব হওয়ায় ভারতবর্ষে বৌদ্ধরা শুধু পরাজিতই নয় , ছিন্ন - বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ।

এর ফলে বৌদ্ধ নেশনের মৃত্যু ঘটল । শঙ্করাচার্য ও বিভিন্ন অ - বৌদ্ধ রাজার সহযোগিতায় যে নূতন সেন্টিমেন্ট ভারতবর্ষে গড়ে উঠল , যাকে সনাতনী বা ব্রাহ্মণ্য মতবাদ বলা হয় , তার প্রতিষ্ঠা ছিল মূলতঃ বৌদ্ধবিরোধী মনোভাবের ওপর । তাই ৰৌদ্ধ নেশনের মৃত্যু ঘটবার পর এই ব্রাহ্মণ্য নেশন বেশী দিন টিকে

থাকতে পারেনি। ভারতবর্ষে আবার দেখা দিল নেশন - হীন অবস্থা।

বৈদিকোত্তর যুগে ভারতবর্ষে যখন আর্য ও অনার্য দু'টি নেশনেরই মৃত্যু ঘটেছিল তখন বাইরে থেকে কোন আক্রমণ হয়নি। দেশের ভেতরেই ঘটেছিল ৰৌদ্ধ বিপ্লব। যদি সে সময় বাইরে থেকে কোন বড় রকমের আক্রমণ হত তাহলে আক্রমণকারীরা অনায়াসেই তৎকালীন নেশন - হীন ভারতবর্ষকে দখল করে নিতে পারত। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য , যখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য নেশনের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার এদেশ নেশন - হীন হ’ল তখন কোন অভ্যন্তরীণ বিপ্লব দেখা দিল না। ঘটল বাইরে থেকে মুসলমান আক্রমণ।

ৰৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণভাবে যখন বিলুপ্ত হ’ল ও তার কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণ্য নেশনেরও মৃত্যু হ’ল কেবল তখনই মুসলমানরা ভারত জয় করতে পেরেছিল। তার আগে পারে নি। সিন্ধুদেশ আক্রমণ করার পর তাদের অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্য নেশন ছিন্ন - বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও নবসৃষ্ট ছোট ছোট নেশনগুলিও একক ভাবে নিতান্ত দুর্বল

ছিল না , আর তাই তারা শেষ পর্যন্ত মুসলমান আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল ।

মুসলমানরা ভারতবর্ষে আসার পর এদেশে দেখা দিল একটা নূতন মুসলমান নেশন । তাদের ছিল নিজস্ব ভাষা (গোড়ার দিকে তুর্কী , পরে ফার্সী) , নিজস্ব আচার - ব্যবহার , পোষাক - পরিচ্ছদ , রক্তধারা , জীবনযাত্রা প্রণালী ও ধর্মমত , আর এর সঙ্গে ছিল ওইগুলির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটা বিজয়ী সেন্টিমেন্ট । একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে সেকালের সেই বিজয়ী মুসলমান নেশন ভারতবর্ষের তৎকালীন অধিবাসীদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছিল । যেমনটি করেছিল অনার্যের উপর আর্য , অবৌদ্ধের উপর বৌদ্ধ , বৌদ্ধের উপর ব্রাহ্মণ্য নেশন । অ - মুসলমানদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার অ - মুসলমানদের নূতনভাবে একতাবদ্ধ করল । তাদের মধ্যে দেখা দিল পাল্টা মুসলমান - বিরোধী সেন্টিমেন্ট (anti - Muslim_sentiment) । ভারতবর্ষে দেখা দিল দু'টি নেশন — একটি নেশন খাড়া করল ফার্সী ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিজয়ী মুসলিম সেন্টিমেন্ট , অপরটি ভারতের সাবেকী ভাষা সংস্কৃতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা

হিন্দু সেন্টিমেন্ট। ভারতে দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি এই দু'টো নেশন বেঁচে রইল।

মুসলমান নেশন চলেছিল একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের সেন্টিমেন্টকে আশ্রয় করে কিন্তু ঠিক ততখানি জোরালো সেন্টিমেন্ট অ - মুসলমান বা হিন্দুর ছিল না। তাই তাদের গড়ে উঠতে হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে মুসলমান - বিরোধী একটা সেন্টিমেন্ট অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য নেশনের মত একটা ঋণাত্মক সেন্টিমেন্টের ভিত্তিতে। তাই ব্রাহ্মণ্য নেশনের নেতারা যেমন বৌদ্ধ - বিদ্বেষকে নিজেদের পুঁজি হিসেবে দেখেছিলেন ঠিক তেমনি হিন্দু নেশনের নেতারা পুঁজি করেছিলেন মুসলমান - বিদ্বেষকে। মুসলমান যা করবে হিন্দুকে তার ঠিক উল্টোটা করতে হবে। মুসলমান নামাজ পরবার সময় কাছা দেয় না, তাই হিন্দুকে কাছা দিয়ে কাপড় পরতেই হবে। গোমাংস ও কুক্কুট মাংস মুসলমানদের অতি প্রিয়, তাই হিন্দুদের পক্ষে সেগুলি অভক্ষ্য। মুসলমান পশ্চিম মুখে উপাসনা করে, তাই হিন্দুর পশ্চিম মুখে উপাসনা নিষিদ্ধ। এ ধরনের আরও কত কী! যাই হোক, এই ধরনের বিধি - নিষেধের ফল হিন্দুর পক্ষে খারাপ হয়েছিল একথা

বলতে পারি না। এগুলোর সাহায্যে হিন্দুর মধ্যে মুসলিম - বিরোধী সেন্টিমেন্ট ভালভাবেই গড়ে উঠেছিল। নইলে সেযুগে ভারতের অ - মুসলমানদের পক্ষে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হত না।

যেমন আমরা আর্য - অনার্যের ব্যাপারে দেখেছি যে পাশাপাশি দু'টো নেশন দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের স্বতন্ত্র সেন্টিমেন্ট জীইয়ে রাখতে পারেনি, হুবহু তেমনই ব্যাপার ঘটল হিন্দু ও মুসলমান এই দু'টি নেশনের ব্যাপারেও। মুসলমানের ভাষা ফার্সী ছিল সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা, আর হিন্দুর ভাষা প্রাকৃত ছিল ভারতের মাটিতে তৈরী। তাই শেষ পর্যন্ত প্রাকৃত - সঞ্জাত পূর্বী পাঞ্জাবী বা পশ্চিমী হিন্দীর সঙ্গে ফার্সী মিশিয়ে রাজধানীর মুসলমানেরা গড়ে তুলল একটি মিশ্র ভাষা যার নাম উর্দু ভাষা। এতে মুসলমানদের ন্যাশন্যাল সেন্টিমেন্ট কিছুটা চিড় খেয়ে গেল। হিন্দুদের সঙ্গে তাদের একটা বোঝাপড়ায় নামতে হ'ল। হিন্দুদের অন্যান্য ভাষাতেও ঢুকল অজস্র ফার্সী শব্দ। জন্ম নিল হিন্দু - মুসলমানের মিলিত ভাষা বাংলা, মৈথিলী, অসমিয়া, ভোজপুরী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষাগুলি।

মুসলমান পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষকে ভালভাবে জানবার জন্যে শিখতে লাগলেন সংস্কৃত ভাষা। হিন্দুরাও শিখতে লাগলেন উর্দু, ফার্সী। হিন্দু নিল মুসলমানের পায়জামা - শেরওয়ানী , মুসলমান নিল হিন্দুর ধুতি - চাদর। মুসলমান নিল হিন্দুর পদবী ‘ চৌধুরী ’ , ‘ মণ্ডল ’ ; হিন্দু নিল মুসলমাপের পদবী ‘ মল্লিক ’ , ‘ খাঁ ’ , ‘ সরকার ’ , ‘ মজুমদার ' । হিন্দু দিতে শুরু করল পীরের দরগায়শির্ণী। হিন্দুর সত্যনারায়ণ মুসলমানদের হয়ে গেল সত্যপীর। বিজয়ী মুলনমানের সাথে বিজিত হিন্দুর সম্পর্ক আর পূর্বেকার মত রইল না। হিন্দু - মুসলমান ভাই ভাই হয়ে দাঁড়াল। মুসলমানের মুসলিম সেন্টিমেন্ট অসম্ভব রকমের দুর্বল হয়ে গেল। সেন্টিমেন্ট দু'টো লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় হিন্দু - মুসলমান নেশন দু’টোরও মৃত্যু ঘটল। তৃতীয় বার ভারতবর্ষ নেশন - হীন হয়ে পড়ল। ঠিক এই অবস্থায় ভারতবর্ষে যে মহারাষ্ট্রীয় , রাজপুত বা শিখদের স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছিল সেগুলোর সূত্রপাত হয়েছিল মুসলমান - বিরোধী সেন্টিমেন্টের ভিত্তিতে কিন্তু হিন্দু - মুসলমানের সৌভ্রাত্র বেড়ে যাওয়ায় মহারাষ্ট্রীয় , রাজপুত ও

শিখদের সেন্টিমেন্ট বেশী দিন বেঁচে থাকতে পারল না। সেন্টিমেন্টের অভাবে ভারতবর্ষ ছিন্ন - বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার যখন ভারতবর্ষ নেশন - শূন্য হয়েছিল তখন ঘটেছিল মুসলমান আক্রমণ। আর তৃতীয় বার ভারতবর্ষ যখন নেশন - শূন্য হ'ল তখন এল ইংরেজের অভিযান। নেশন - হীন ভারতবর্ষকে ইংরেজ অল্পায়াসেই দখল করে নিল।

মুসলমানরা ভারতবর্ষ দখল করেছিল বটে , কিন্তু ভারতবর্ষকে তারা নিজেদের মাতৃভূমি রূপে গ্রহণ করেছিল। বিদেশী হিসেবে তারা ভারতবর্ষকে কেবল শোষণ করেছিল একথা কেউ বলবে না। কিন্তু ইংরেজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়াল অন্য রকমের। ইংরেজরা ভারতবর্ষে বসবাস করতে আসেনি , এসেছিল অর্থোপার্জন করতে। ভারতবর্ষ জয় করে তারা তাদের শোষণযন্ত্র পুরোদমে চালিয়ে দিয়েছিল। আর শোষণকার্যের সুবিধার জন্যে তারা গড়ে তুলেছিল একটা শক্তিশালী গবর্ণমেন্ট। এই গবর্ণমেন্ট ভালভাবে চালাবার জন্যে তারা গড়ে তুলেছিল ইংরেজী - জানা একটা শিক্ষিত সমাজ। ইংরেজের শোষণযন্ত্র ভারতের সকল শ্রেণীর অধিবাসীর চোখ খুলে দিল। তখন

ইংরেজ - বিরোধী একটা সেন্টিমেন্টের ভিত্তিতে ভারতের সকল শ্রেণীর অধিবাসী ক্রমশঃ একতাবদ্ধ হয়ে উঠল । ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল একটা নেশন আর এই নেশনকে একসূত্রে বেঁধে রাখল ইংরেজী ভাষা । ইংরেজী আর শুধু ইংরেজরে ভাষা রইল না । ইংরেজী হ'ল বহু ভাষা - ভাষী ভারতবর্ষের মিলনসূত্র ।

যদিও ইংরেজরা ইচ্ছাকৃতভাবে চায়নি , তবুও তাদেরই চেষ্টাতেই ভারতীয় নেশন গড়ে উঠল । শতধাবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ দেশ বা রাষ্ট্র হিসেবে একতাবদ্ধ হ'ল যা এর আগে ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি । অজস্র ভাষা , লিপি , অজস্র ধর্মমত , অজস্র জাত - গোষ্ঠী তথা আচার - ব্যবহার , খাদ্য , বেশভূষা নিয়ে যে ভারতবর্ষ , তার কখনও ঠিক নিজস্ব ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা ছিল না । চিরকালই ভারতবর্ষ ছিল বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত , ছিল তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের ইতিহাস । পাণ্ডবেরা অথবা অশোক অথবা কণিষ্ক বা সমুদ্রগুপ্ত — কেউই সমগ্র ভারতবর্ষে একটি রাষ্ট্র - ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেন নি । ইংরেজরা তা করল । ইংরেজের জাতীয়তাবোধ দেখে

ভারতবর্ষের লোকেরা ঠেকে শিখল ও তাদের মধ্যে জাতীয়তাৰোধ (Nationalism) জাগল।

এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় নেতাদের একটা মস্ত বড় ভুল হয়েছিল। রাজনৈতিক সংগ্রাম না করে তাঁদের উচিত ছিল অর্থনৈতিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া। ভারতীয় নেতাদের এই ভুল ইংরেজরা ভালভাবে কাজে লাগাল। তারা ভারতীয় নেশনকে দু'টুকরো করার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। তারা মুসলমানদের মাথায় ঢুকিয়ে দিল যে ভারতবর্ষে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য , সুতরাং ইংরেজরা যদি এদেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে স্বাভাবিক নিয়মেই রাজনৈতিক ক্ষমতা হিন্দুদের হাতে আসবে। সমগ্র ভারতে মুসলমানগণকে তখন হিন্দুদের প্রজা হিসেবে কাজ করতে হবে। ইংরেজের এই কূটবুদ্ধি সুন্দরভাবে কাজে লাগল। মুসলমানদের মধ্যে জাগল একটা হিন্দু - আতঙ্ক (Hindu - phobia) । মুসলমান নেতারা তারস্বরে এই হিন্দু - আতঙ্কের কথা প্রচার করতে লাগল ও এই হিন্দু - আতঙ্ক সঞ্জাত হিন্দুবিরোধী মনোভাবে ফলে (anti Hindu sentiment) বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে নূতন করে আবার একটা মুসলিম নেশন গড়ে উঠল। হিন্দু -

আতঙ্কের দরুণ তারা দাবী করে বসল স্বতন্ত্র বাসভূমি (Homeland for the Muslim Nation) I তাদের এই স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবী ঠেকিয়ে রাখা হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হয়নি কারণ হিন্দু নেশন বলে কোন নেশন বিংশ শতাব্দীতে তৈরী হয়নি I কেন তৈরী হয়নি তার কারণ খুবই সহজ I সমগ্র ভারতে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকায় তাদের মনে মুসলিম - আতঙ্ক তৈরী হয়নি আর তাই মুসলমান - বিরোধী সেন্টিমেন্ট না থাকায় নূতন করে হিন্দু নেশন গড়ে ওঠেনি I

ৰাঙলা ও পঞ্জাবে কিন্তু ব্যাপারটা ছিল অন্য ধরনের I ওই দু'টি প্রদেশই ছিল মুসলমান - প্রধান I দু'টি প্রদেশই সামগ্রিকভাবে মুসলিম হোমল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত হলে সেখানকার হিন্দুগণকে মুসলমানের প্রজা হিসাবে বাস করতে হবে I ওই দু'টি প্রদেশে হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম - আতঙ্ক তথা মুসলিম - বিরোধী মনোভাব জেগেছিল ও সেই কারণে ওই দুই প্রদেশে তারা হিন্দুদের জন্যে স্বতন্ত্র হোমল্যান্ড দাবী করেছিল I তাই ভারতবর্ষ যখন বিভক্ত হ’ল , ৰাঙলা ও পঞ্জাবও বিভক্ত হ'ল I

ব্রিটিশ - বিরোধী সেন্টিমেন্টের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন প্রথম ভারতীয় নেশন গড়ে উঠল , ভারতবর্ষের তৎকালীন নেতাদের উচিত ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম না করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করা। অর্থনৈতিক সংগ্রামে হিন্দু - মুসলমান - পাঞ্জাবী - মারাঠী ভেদ না থাকায় সকল ভারতবাসীই একযোগে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারত ও সেই সংগ্রামের ফলে সারা ভারতবর্ষে দেখা দিত একটা শোষণ - বিরোধী সেন্টিমেন্ট। সেই সেন্টিমেন্ট ভারতবাসীকে নেশন হিসাবে আরও মজবুত করে গড়ে তুলতে পারত। সংগ্রাম রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে না হওয়ায় ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লে হিন্দুদের প্রজা হিসেবে আমাদের থাকতে হবে — মুসলমানদের মনে এই ধরনের হিন্দু - আতঙ্ক বা হিন্দু - ফোবিয়া উৎপন্ন হবার কোন সুযোগই থাকত না। হিন্দু - ফোবিয়া না থাকায় মুসলিম নেশনের জন্যে হোমল্যান্ডের দাবীও থাকত না। আর ভারতবর্ষ যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করত তখন দেখা যেত হিন্দু - মুসলমান পরস্পর সৌভাত্রের মধ্যে অবিভক্ত ভারতবর্ষে মিলিত ভাবে বসবাস করছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম

রাজনৈতিক স্বাধীনতাও এনে দিত। হয়তো তাতে একটু দেরী হ'ত, কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবশ্যই আসত।

ইংরেজরা যখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপে (ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অহিংস নীতিতে আসেনি) ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে মনস্থ করল, তখন হিন্দু নেতাদের দাবী ছিল অখণ্ড ভারত আর মুসলিম নেতাদের দাবী ছিল মুসলিম হোমল্যাণ্ড। এই দুইয়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কোন উপায় ছিল না। তাই ভারতবাসী চা’ক বা না চা’ক, ইংরেজদের ভারতবর্ষকে বিভক্ত করতেই হ’ল।

এই অবস্থায় ভারতবর্ষের বিভাজন এড়িয়ে যাবার কোন উপায় কি দেশীয় নেতাদের হাতে ছিল না? হ্যাঁ, ছিল। তখন তাঁরা যদি বিভক্ত ভারত মেনে না নিয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন শুরু করতেন, স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ পাওয়া তখনও অসম্ভব হ'ত না। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান নেতৃবৃন্দ তা চাননি। কেন চাননি তা তাঁরাই জানেন।

প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম কেবল ইংরেজ শোষণের বিরুদ্ধেই সীমিত থাকত না, সে সংগ্রাম ভারতের

পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হ'ত। ইংরেজরা যদি দেখত যে তাদের শোষণ আর চলছে না , তখন তারা বাধ্য হয়ে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও দিয়ে দিত। আর সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে দেশীয় পুঁজিপতিদের ' শোষণও বন্ধ হ’ত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের নেতারাই ছিলেন পুঁজিবাদী। তাই তাঁরা এই অবস্থাটা হতে দিতে চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রেখে দেশের স্বাধীনতা। এই জন্যে বাধ্য হয়েই তাঁরা খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা মেনে নিলেন।

এদেশীয় নেতৃবৃন্দের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না চাওয়ার আরও দু’টো কারণ ছিল। তার একটা হচ্ছে : রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল , অর্থনেতিক স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতা হিসেবে যোগ্যতা প্রমাণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারত। বিশেষ করে , অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম যে কোন সময়ে গণবিপ্লবের তথা রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পথ নিতে পারে। আর তাতে বিপ্লবীদের মধ্য থেকে তরুণ নায়কের আবির্ভাবের সম্ভবনাও থেকে যায়। নেতারা সেটা চাননি। তাঁরা

অহিংসার বুলি কপচে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

নেতাদের এ ব্যাপারে আরেকটা দুর্বলতাও ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের অধিকাংশ নেতাই রাজনৈতিক সংগ্রাম করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন যে যদি নূতন করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ করা যায় আর সেই সংগ্রাম যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে তাঁদের ভাগ্যে আর মন্ত্রিত্বের মসনদ জুটবে না। সম্ভবতঃ এই কথাটা মনে রেখে তাঁরা দেশ বিভাগের মত জঘন্য অপরাধকেও মেনে নিয়েছিলেন।

কোথায় ভুল হয়েছিল :

যে যুক্তিতে ইয়ূরোপ বহু নেশনের বাসভূমি ঠিক সেই যুক্তিতেই ভারতবর্ষও বহু নেশনের দেশ। বরং ইয়ুরোপের দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য যতখানি ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যেকার পার্থক্য সে তুলনায় অনেক বেশী। ৰাঙালী, অসমিয়া, ওড়িয়া, অন্ধ্র, তামিলী, মালয়ালী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, ডোকরী, কাশ্মীরী, লাদাকী, মৈথিলী, মগৃহী, ভোজপুরী — এদের প্রত্যেকের রয়েছে

নিজস্ব ভাষা , রীতি - নীতি , জীবনযাত্রা প্রণালী , রক্তধারা , উচ্চারণরীতি , ইতিহাস ও ঐতিহ্য । কারও কারও নিজস্ব লিপি , পঞ্জিকা , দায়াধিকার ব্যবস্থা ও পোষাক - পরিচ্ছদও রয়েছে । ইয়ূরোপের দেশগুলির পারস্পরিক পার্থক্য অতটা প্রকট নয় । তথাপি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম , ইংরেজী ভাষা ও ব্রিটিশ - বিরোধী সেন্টিমেন্ট একটা ভারতীয় রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল । ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ - বিরোধী সেন্টিমেন্টও আর নেই । তাই অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটেছে । আজ খুব কম সংখ্যক লোকই নিজেকে ভারতীয় বলে ভেবে থাকে । আজ তারা নিজেকে কেউ পাঞ্জাবী , কেউ তামিল , কেউ বাঙালী , কেউ ভূমিহার , কেউ বা রাজপুত হিসেবে ভাবে — ভারতীয় তারা কেউই নয় । এদের মধ্যে আজ ক্ষীণতম যোগসূত্র হিসেবে বেঁচে রয়েছে ইংরেজী ভাষা । রাষ্ট্রীয়তার ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সেই ইংরেজীকেও হঠকারী নেতারা আজ তাড়াবার চেষ্টা করছে । স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ইংরেজী বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পূর্ণ ১৭

ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ব্রিটিশ - বিরোধী সেন্টিমেন্টের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উচিত ছিল এদেশে একটা নূতন সেন্টিমেন্ট গড়ে তোলা— ভারতীয় নেতারা তা করেননি। পাকিস্তানী নেতারা কিছুটা করেছেন। তাঁরা ব্রিটিশ - বিরোধী সেন্টিমেন্টের স্থলে গোড়ার দিকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন হিন্দু - বিরোধী সেন্টিমেন্টকে , তারপর কশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুললো ভারত - বিরোধী সেন্টিমেন্টকে। এই সেন্টিমেন্টগুলো নেশন হিসেবে পাকিস্তানের জনগণকে কিছুটা সাহায্য করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে কোন সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠেনি। পাকিস্তানের মত সুযোগ ভারতেও এসেছিল। তারাও পাকিস্তান বিরোধী সেন্টিমেন্ট , গোয়াকে কেন্দ্র করে পর্তুগীজ - বিরোধী সেন্টিমেন্ট , ভারতবর্ষের উপর চীনের আক্রমণকে কেন্দ্র করে চীন - বিরোধী সেন্টিমেন্টের দ্বারা ব্রিটিশ - বিরোধী সেন্টিমেন্টের শূন্যস্থান পূরণ করে ভারতীয় নেশনকে জীইয়ে রাখতে পারত। কিন্তু তারা তা করেনি , নেতারা কল্পনার আকাশে উড়ে বেড়িয়েছেন।

সবচেয়ে পরিতাপের কথা হচ্ছে এই যে কোন মজবুত সেন্টিমেন্টের ভিত্তিতে নেশন গড়ার চেষ্টা তো হয় - ই নি , বরং

ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে যেটুকু বা পারস্পরিক ভালবাসা , প্রেম , সৌহার্দ্য ছিল , তাও নেতাদের হঠকারিতায় নষ্ট হতে বসেছে । বর্তমানে ভারতীয় নেতৃত্বের যে তিনটি প্রধান ত্রুটির দরুণ ভারতবর্ষের সংহতি নষ্ট হতে বসেছে তাদের একটি হচ্ছে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রচেষ্টা , দ্বিতীয়টি হ'ল রাষ্ট্র - ভাষা , আর তৃতীয়টি হ'ল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল মাত্র স্থানীয় ভাষার ব্যবহার ।

আগেই বলেছি , বহু ভাষা , বহু ধর্মমত , বহু আচার - ব্যবহারের সমন্বয়ে যে ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে , যার জনগণের পারস্পরিক ভেদ - বিভেদ ইংরেজ , জার্মান , ফরাসী প্রভৃতি নেশনগুলোর পার্থক্যের চাইতে কোন অংশে কম নয় , সেখানে এই পার্থক্যগুলোকে কেন্দ্র করে কোন সেন্টিমেন্ট গড়বার সুযোগ দিলে তার ফল যে অত্যন্ত মারাত্মক হবে একথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন সাধারণ ছাত্র ও সহজেই বুঝতে পারে । অথচ ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের কাজে হাত লাগিয়ে নেতারা ঠিক সেই ভুলটাই করেছেন । আজ বিভাগ , জেলা , মহকুমা , থানা , এমনকি গ্রামের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে মন কষাকষি চলছে । যে দেশে এখন নেশন বলতে কোন কিছুই নেই সে দেশে

এই পারস্পরিক বিবাদের পরিণাম কত মারাত্মক , ভারতের শুভানুধ্যায়ী মাত্রেরই তা ভেবে দেখবার দিন এসেছে। অল্প কিছুটা সময়ের মধ্যেই যদি সম্পূর্ণ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি গড়ে দেওয়া হত তাহলেও না হয় কথা ছিল কিন্তু তা তো হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির প্রকৃত সীমানা ঠিক মত নির্ধারণ করাও সম্ভব নয় , প্রত্যেক রাজ্যেই কিছু না কিছু দ্বিভাষী বা ত্রিভাষী অঞ্চল থেকেই যাবে। তবুও ভাষার ভিত্তিতে যতটুকু করা সম্ভব ছিল , তাও করা হয়নি। আর এর ফলে হয়েছে কি ? – না , ভারতবর্ষের সর্বত্রই ভাষাগত সংখ্যালঘুরা এক নৈরাশ্যের দ্বারা গ্রস্ত রয়েছে।

ভারতের আভ্যন্তরীণ ঐক্য অত্যন্ত দ্রুত অবনতির পথে চলেছে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের কাজে হাত লাগিয়ে তার শেষ রক্ষা করতে না পারায় ভারতের সংহতির পক্ষে তা অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গড়ার কথাটা তোলাই উচিত হয়নি। কিছুদিন আগে কোন একটি প্রদেশের নেতৃস্থানীয় কিছু লোকেরাই বলতে শুরু করেছিলেন যে সীমানা কমিশন তাঁদের প্রতি সুবিচার করেনি — তাই তাঁরা

ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে যাবেন। বুঝুন তথাকথিত ভারতীয় নেশনের কী শোচনীয় অবস্থা !

রাষ্ট্র ভাষার মত একটা বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা করা খুবই হঠকারিতার কাজ হয়েছে ; এতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য তো বাড়েই নি , বরং তার বৈপরীত্যে অনৈক্যের মাত্রা বহুলাংশে বেড়ে গেছে।

কেউ কেউ আবার সমগ্র ভারতবর্ষের জন্যে একটি লিপি ২০ দেশপ্রেমিকদের প্রতি প্রবর্তনের কথা ভাবছেন। এটা কি আদৌ বৈবহারিক বা বাঞ্ছনীয় ? সমগ্র পাকিস্তানে উর্দুলিপি প্রবর্তনের পরিণাম কি তাঁরা ভুলে গেছেন ? (পাকিস্তানের ন্যাশান্যাল সেন্টিমেন্ট তবু তো ভারতের চেয়ে ঢের বেশী মজবুত ছিল) । যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়তাবাদ একটি নির্দিষ্ট রূপই পরিগ্রহ করেনি সেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কী - ই বা বলা যায় ! ভারতবর্ষ বহু লিপির দেশ। প্রতিটি লিপিই প্রায় সমান পুরোনো। ভারতের সা সম্পত্তি সংস্কৃত অতি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন লিপিতেই লিখিত হয়ে আসছে। সংস্কৃত লিপি বলে কোন লিপি নেই। ভারতীয় বর্ণমালা (alphabetical order) ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মত হলেও বৈবহারিক ক্ষেত্রে লিপিগুলি বিজ্ঞানসম্মত নয়।

রোমান লিপি বিজ্ঞানসম্মত হলেও ঢালাও ভাবে ভারতের প্রতিটি ভাষাতে ব্যবহার করা ক্ষতিকর। যে সকল ভাষায় সাহিত্য বলতে কিছুই নেই (যেমন কোঙ্কনী , সাঁওতালী , খাসিয়া প্রভৃতি) অথবা যে ভাষাগুলি এখন আর জনগণের কথ্য ভাষা নয় (যেমন সংস্কৃত , পালি) সেগুলোতে রোমান অক্ষর ব্যবহারে হয়তো কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু যেগুলি সাহিত্য - সমৃদ্ধ জীবিত ভাষা (যেমন বাংলা , হিন্দী , তামিল , গুজরাটী) সেগুলোতে রোমান অক্ষর ব্যবহার করলে ভাষাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে , কারণ তাতে করে তাদের অতীতের সাহিত্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের সাহিত্যের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার , কামাল পাশার সময় তুর্কি ভাষা যখন আরবী লিপি ছেড়ে রোমান লিপি গ্রহণ করেছিল বা মারাঠী ভাষা যখন মোড়ী লিপি বর্জন করে নাগরী লিপি গ্রহণ করেছিল তখন সাহিত্যের ব্যাপারে তারা ছিল খুব অনগ্রসর। আজকে মারাঠী বা তুর্কীর পক্ষে লিপি পরিবর্তন করা রীতিমত ক্ষতিকর। কোথাও লিপিগত পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় কি না সে ব্যাপারটা সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীদের স্বাধীন ইচ্ছার ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

এ ব্যাপারে আরও একটা বড় সমস্যা রয়েছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ও উর্দু ও পাকিস্তানী দুই - ই বটে , সুতরাং তাদের লিপি পরিবর্তন করা কেবল ভারতবর্ষ বা কেবল পাকিস্তানের এক্তিয়ারের বাইরে। সমগ্র ভারতবর্ষে কেবলমাত্র বাংলা বা কেবলমাত্র উর্দু লিপি ব্যবহার করলেও সমস্যার সমাধান হবে না যদি না পাকিস্তানও তা মেনে নেয়। অন্যথায় কেবলমাত্র একটির রাষ্ট্রলিপি পরিবর্তন করলে ভাষাগুলি দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জনসাধারণ মাতৃভাষাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিতে চাইবে না। তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে — যেমনটি হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে ৰাংলা ভাষায় উর্দু লিপি চালাবার প্রচেষ্টার প্রতিবাদে। যে কল্পনায় অশান্তির সম্ভবনা থাকে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া কি বিবেচকের কাজ ? নেতৃবৃন্দ কল্পনার নেশা ছেড়ে দিয়ে বাস্তবের মাটিতে নেমে দেখুন বাস্তবের মাটি খুবই কঠোর , খুবই নিষ্করুণ।

উষ্চতর শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রায় সর্বত্রই আজকাল স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। ইংরেজ আমলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। ভারতবর্ষের যে

কোন প্রদেশের ছাত্র যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ইংরেজীর মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে পারত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রদের পারস্পরিক মেলামেশার ফলে একটি সর্বভারতীয় ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠত। কিন্তু আজ স্থানীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ যাচ্ছে কমে। প্রতিদিন আন্তঃরাজ্য সম্পর্ক জাগাবার অবকাশ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে। ছাত্ররা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের প্রদেশের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় সর্বভারতীয় চেতনার অভাবে প্রাদেশিকতাবাদ ক্রমশঃ তাদের পেয়ে বসেছে। বড় বড় নেতারা প্রদেশের ইগুলোর নিন্দা করছে কিন্তু ইগুলো থেকে ছাত্রদের দূরে রাখবার কোন বাস্তবোচিত পন্থা নিচ্ছে না।

■ এখন কী করা উচিত :

ভাষাভিত্তিক প্রদেশের কথা ভুলে গিয়ে তার পরিবর্তে অবিলম্বে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন করা ; জীবনের সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী সহ ভারতের প্রতিটি ভাষাকে নিজ নিজ অঞ্চলে ষোল আনা সুযোগ - সুবিধা দেওয়া। এ ব্যাপারে বাংলা ,

হিন্দী , মারাঠী , তামিল প্রভৃতি উন্নত ভাষাগুলিকে ও মৈথিলী , ভোজপুরী , মগহী , তুলু , কোঙ্কনী প্রভৃতি অনুন্নত ভাষাগুলিকে ঠিক সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে । উনিশ - বিশ করলে চলবে না । কাউকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করলে চলবে না । ভাষার ক্ষেত্রে সবাই যদি সমান সুযোগ - সুবিধা পায় তবে কেউই ভাষাভিত্তিক রাজ্যের কথা ভাববে না । ভবিষ্যতে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের কোন প্রয়োজন দেখা দেবে কি না তা ' ভবিষ্যতের শক্তিশালী ভারতীয় রাষ্ট্র স্থির করবে । তা নিয়ে বর্তমান নেতাদের মাথাব্যথার কোন প্রয়োজন নেই । তাঁরা যেন সবার প্রতি সুবিচার করে যান । ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরেজীর স্থানে অন্য কোন ভাষা ব্যবহার আবশ্যকতা আছে কিনা তা নিয়েও বর্তমানের নেতাদের মাথা না ঘামালেও চলবে । তার আগে তাঁরা এক সুদৃঢ় সেন্টিমেন্টের ভিত্তিতে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তুলুন । নেশন গড়ে ওঠার পর রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী থাকবে কি না অথবা ইংরেজীর স্থানে অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা উচিত হবে কি না সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায় - দায়িত্ব ভবিষ্যতের ভারতীয় নেশন গ্রহণ করবে ।

আঞ্চলিক বিবাদ - বিসংবাদ দেখা দিতে পারে এমন সমস্যা নিয়েও সময় অপচয় করার এটা উপযুক্ত সময় নয় I এখন যে নেশনই নেই ! বহু নেশনের বাসভূমি আজকের ভারতবর্ষের অবস্থা একটা বিবদমান যৌথ পরিবারের মত I এরা সকলে মিলেমিশে যদি একটা নেশন গড়ে তুলতে নাও পারে , সেক্ষেত্রে একটা যৌথ আদর্শের ভিত্তিতে একটি দৃঢ়নিবদ্ধ নেশনগোষ্ঠী (a compact multi - national unit) গড়ে তুলে পরস্পর মিত্রতা - বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যৌথ পরিবারের মত মিলেমিশে বাস করতে পারে I মনে রাখতে হবে মাথা - গুণতি বোটের জোরে সবসময় কাজ করতে গেলে যৌথ পরিবারের একতা রক্ষিত হবে না— সে ক্ষেত্রে যারা হেরে যাবে তারা যৌথ পরিবারের বাইরে চলে যাবে অর্থাৎ যৌথ পরিবারের মৃত্যু ঘটবে I

যৌথ পরিবার বেঁচে থাকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের (এখানে ভারতের প্রতিটি নেশনের) সদিচ্ছার ওপরে I অত্যন্ত দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে বর্তমান ভারতে এই সদিচ্ছার অভাব দেখছি I বড় বড় নেতারাও দেশের সামগ্রিক স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে নিজের নিজের নেশনের (কোথাও ভাষাভিত্তিক , কোথাও প্রদেশভিত্তিক , কোথাও সম্প্রদায়ভিত্তিক , কোথাও

জাতপাতকেন্দ্রিক স্বার্থই দেখছেন। আজ তাঁরা কেউই ভারতীয় নেতা নন — সবাই নিজের নিজের নেশনের নেতা ; অন্যান্যদের স্বার্থ তাঁদের হাতে নিরাপদ নয়।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী থাকা উচিত। প্রশ্নপত্রও ইংরেজীতে হওয়া উচিত। তবে উত্তরপত্র ইংরেজী অথবা ছাত্রদের সুবিধামত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ভাষাগুলিতে লিখবার অধিকার থাকা উচিত। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যত অধিকসংখ্যক ভাষাকে স্বীকৃতি দেয় , দেশ ও ছাত্রের পক্ষে ততই মঙ্গল। স্কুল - ফাইন্যাল পরীক্ষাতেও ইংরেজী সহ কয়েকটি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ভাষাতে উত্তর লিখবার অধিকার থাকা উচিত। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ভাষাগুলির সমান ব্যবহার থাকা দরকার ও প্রশ্নপত্র অনুরূপভাবে হওয়া দরকার। পঠন - পাঠনের মাধ্যম হিসেবে কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করলে স্কুলের ছাত্রদের অসুবিধা হতে পারে। তবে পঠন - পাঠনে ও প্রশ্নপত্রে ইংরেজী একটি স্বীকৃত ভাষা হিসেবে অবশ্যই থাকা দরকার। অন্যথায় দূরবর্তী প্রদেশ থেকে আসা ছাত্রদের (যেখানে কারো মাতৃভাষা

স্বীকৃত ভাষার তালিকাভুক্ত নয়) শিক্ষালাভ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে ।

কিন্তু এগুলো তো গেল বিরোধ রোধ করবার প্রচেষ্টা । এতে তো আর নেশন বা নেশনগোষ্ঠী গড়া যাবে না । নেশন বা নেশনগোষ্ঠী গড়তে গেলে বর্তমান ভারতকে আর কী কী করতে হবে ?

ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র । তারা পুঁজিবাদের শোষণ থেকে অব্যাহতি পেতে চায় । তাদের কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কোন মূল্যই বহন করে না যদি না তা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনতে পারে । আমি ভারতের অনেক দুঃস্থ চাষীবাসী লোকেদের বলতে শুণেছি , “ বাবু , ইংরেজের বোট - বাক্সে বোট দেওয়া যায় না ? আমরা তাই দেব । তাদের রাজত্ব ভাল ছিল । ” কথাগুলো বর্তমান নেতাদের পক্ষে নিশ্চয় গৌরবজনক নয় । ভারতবাসীদের নিয়ে মজবুত একটি নেশন বা নেশনগোষ্ঠী গড়তে গেলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমেই তা ’ গড়তে হবে । মুখে সমাজবাদ বা সমাজবাদী ধাঁচ (Socialistic Pattern) বা কল্যাণ রাষ্ট্রের (Welfare state) নামে বড় বড় বুলি

কপচিয়ে গেলে কোন কাজ হবে না। এধরনের শ্লোগানের ফলে জনসাধারণের মনে কোন সেন্টিমেন্ট তৈরী হচ্ছে না। আর মজবুত সেন্টিমেন্ট তৈরী না হওয়া পর্যন্ত নেশন বা নেশনগোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে না। জনসাধারণের মনের মধ্যে কোন সেন্টিমেন্ট না থাকার দরুণ সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টাগুলোতে জনসাধারণের দরফ থেকে কোন সাড়া বা সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতবর্ষে। সেন্টিমেন্ট তৈরীর পক্ষে ছোটো - বড় অনেকগুলি সুযোগ এসেছে , আজও রয়েছে।

কিন্তু সে সেন্টিমেন্টগুলোর কোনটিই প্রশংসনীয় নয়। পাকিস্তান - বিরোধী বা পর্তুগীজ - বিরোধী বা চীন - বিরোধী সেন্টিমেন্টের সাহায্যে সাময়িকভাবে ভারতীয় নেশন বা নেশনগোষ্ঠী গড়ে তোলা গেলেও সে সেন্টিমেন্টের জের দীর্ঘকাল ধরে চলবে না। তাছাড়া ওই সেন্টিমেন্টগুলোর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদ্বেষ ছড়ানো হবে ও তার ফলে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। বিশ্ব - বন্ধুত্বের প্রতিষ্ঠা যাঁরা চান তাঁরা এসব প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। যদি ভারতবর্ষে দরিদ্র জনগণের মধ্যে পুঁজিবাদ বিরোধী — আরও মনস্তত্ত্বসম্মত ভাষায় বলতে গেলে সকল রকম শোষণ - বিরোধী সেন্টিমেন্ট (anti - exploitation sentiment

) তৈরী করা হয় , তাতে ভারতবর্ষে কেবল একটা মজবুত নেশন বা নেশনগোষ্ঠীই গড়ে উঠবে না , বরং এই নেশন বা নেশনগোষ্ঠী দীর্ঘ কাল ধরে বেশ মজবুৎ ও ঐক্যবদ্ধ অবস্থাতেই থাকবে । নেতৃবৃন্দের তাই আজ অতীতের ভুল - ভ্রান্তিগুলো শুধরে নিয়ে নূতন ভাবে শোষণ - বিরোধী অভিযান শুরু করতে হবে । ভারতবর্ষকে বাঁচাবার এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই ।

কিন্তু নেতারা কি তা করতে পারবে বা করতে চাইবে ? যদি তারা এমনটি করতে পারে তাহলে খুব ভাল । তবে বর্তমানে অধিকাংশ নেতাই মুখে যত বড় লম্বা - চওড়া বুলি বলুক না কেন , আসলে হয় তারা পুঁজিবাদী অথবা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পুঁজিবাদেরই দালালি করে চলেছে । জনসাধারণ ক্রমশই তাদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে । যাই হোক , বর্তমান নেতারা শোষণ - বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে এ ধরনের ভরসা আমরা ঠিক করে উঠতে পারছি না । তারা এই মজবুত সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে একতাবদ্ধ করবার চেষ্টা করবে না ।

তারা হয়তো শাসনযন্ত্রের দাপট খাটিয়ে জোর করে মানুষকে সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করবে । কিন্তু তা ' কি সম্ভব ! বৈচিত্র্যময়

ভারতবর্ষের স্থানীয় বৈচিত্র্যগুলি শাসনযন্ত্রের ষ্টীমরোলার চালিয়ে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ করা যাবে না আর সেই ধরনের ঐক্য কাম্যও নয় । ষ্টীমরোলার যত বেশী চালানো হবে , জনসাধারণের অসন্তোষও তত মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে । জোর করে কোন কিছু করতে গেলে ভারতের অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে বল্কান রাষ্ট্রগুলির মত । সারা ভারতবর্ষে ছোট - বড় অগুণতি বিবদমান রাজ্য তৈরী হবে । তাই মনে হয় ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্যে বর্তমান নেতৃত্বের অবসর গ্রহণ অত্যাবশ্যক । হ্যাঁ , আরও একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মনে করছি । যাঁরা মনে করেন সর্বোদয় বা ভূদান আন্দোলনও শোষণ - বিরোধী সংগ্রাম তাঁরা ভুল করেন ; বরং ওই জাতীয় আন্দোলন শোষণ - বিরোধী সংগ্রামকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পাশ কাটিয়ে যেতে চায় । ওই ধরনের আন্দোলনে কেবল পুঁজিবাদীদের সুবিধা , কারণ তাতে জনগণের সংগ্রামী মনোভাবকে কৌশলে দাবিয়ে রাখা হয় ।

রাজনীতি আমার ব্যবসাও নয় , পেশাও নয় । আমি ইতিহাসের এক সাধারণ ছাত্র মাত্র । ভারতবর্ষের যে ভয়াবহ চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে আসছে মুখ ফুটে তা ’ প্রকাশ

করা আমার কর্তব্য বলে মনে করছি , যাতে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা আমাকে দোষ না দেন। যাঁরা দেশনেতা এ ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব সর্বাধিক। তাঁরা দেশকে ডোবাতেও পারেন , বাঁচাতেও পারেন। মুখে যাই বলা হোক না কেন , আসলে সরকারী বা বেসরকারী , রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক সকল সংস্থারই নীতি নির্ধারণ করে থাকেন মুষ্টিমেয় দু'চার জন। তাঁরাই সেই সংস্থার নেতা

। বর্তমানে যাঁরা নেতা তাঁদের তাই ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্যে , ভারতবর্ষকে একটি মজবুত নেশন বা নেশন - গোষ্ঠীতে পরিণত করবার জন্যে অবিলম্বে একটা বলিষ্ঠ নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এব্যাপারে কোন টালবাহানা বা কোন কথার মারপ্যাঁচের ফল দেশের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হবে।

নেতারা হয়তো ভাবতে পারেন যে তাঁদের পার্টিগুলোতে (পার্টিগুলির ভেতরকার খবর আমার জানা নেই , তবে সম্ভবতঃ সব পার্টিরই একই অবস্থা) এত বেশী পাপীর ভীড় জমেছে যে তাদের ঝেটিয়ে বিদায় করতে গেলে পার্টিরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। পার্টির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় হোক। পার্টির স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ

অনেক বড় । তাছাড়া যেসব নেতার সত্যিকার জনপ্রিয়তা আছে তাঁরা নিজেদের জনপ্রিয়তার জোরে সৎ ব্যষ্টিদের নিয়ে নূতন পার্টি গড়ে তুলবেন ।

জননেতারা যদি তা না করেন তবে আমার ভয় হয় , হয়তো বা তাহলে যে কোন সময়ে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা দারুণ ভাবে বিপর্যস্ত হবে । বিশেষ করে যখন ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই দেশ বিভাজনের প্রবণতা অত্যন্ত সক্রিয় । ভুললে চলবে না অতীতে ঐক্যের অভাবই বার বার ভারতবর্ষকে পরাধীনতার নাগপাশে বেঁধেছিল । বর্তমানেও যদি ঐক্য বজায় না থাকে তাহলে বুঝতে হবে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ দেউলিয়া হয়ে গেছে ।

আমি আশাবাদী । দেশনেতারা ভারতের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের গহ্বরে ঠেলে দেবেন এ ধরনের কথা ভাবতেও আমার ভাল লাগছে না । আমি আশা করি , নেতারা নিজেদের ভুলত্রুটি বুঝবেন ও সাহসের সঙ্গে বাস্তবের সম্মুখীন হবেন । বর্তমান নেতারা যদি তা না করেন ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ নোতুন করে

তার নেতা তৈরী করে নেবে ও ভবিষ্যতে সেই নেতারা ভারতবর্ষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

আজ ভারতের জনসাধারণের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে নেতাদের ভুলগুলি শুধরে নেওয়া ও শোষণ - বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশকে একতাৰদ্ধ করা। ভারতকে বাঁচাতেই হবে। এই শোষণ - বিরোধী আন্দোলন শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে নয়, ভারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি অনগ্রসর দরিদ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করবে। সবাইকে নিয়ে একটি মজবুত নেশন বা নেশনগোষ্ঠী গড়ে তুলবে। সে নেশনকে নেশনগোষ্ঠীকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। এই শোষণ - বিরোধী সংগ্রামের মাধ্যমে বহু নেশন - বিশিষ্ট রুশ দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই শোষণ - বিরোধী সংগ্রামই চীনকে মজবুত রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলির নেশন - সমূহ এই শোষণ - বিরোধী সেন্টিমেন্টের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ নয়। তাদের ঐক্য অন্য কোন - না - কোন সেন্টিমেন্টের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাই তাদের আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা অপেক্ষাকৃত অল্প। তারা সকলেই কিন্তু নিজেদের আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যগুলোকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি

দিয়েই নিজেদের একতা রক্ষা করে চলেছে। ভারতবর্ষের জননেতাদের এই জিনিসটা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অধ্যয়ন করা উচিত। যদিও শোষণ - বিরোধী সেন্টিমেন্ট নেশন বা নেশনগোষ্ঠী গড়ার সবচেয়ে বড় উপকরণ , তবু এই সেন্টিমেন্টও খুব দীর্ঘকাল ধরে কোন নেশনকে বা নেশনগোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না । শোষণ একদিন বন্ধ হবেই । বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে শোষণ যদি ষোল আনা বন্ধ না-ও হয় , শোষণের তীব্রতা যে এতখানি থাকবে না একথা বেশ জোর করে বলা চলে । যখন যে দেশের শাসনক্ষমতা সত্যিকারের সবিপ্রের হাতে আসবে তখন সে দেশে শোষণ প্রায় বন্ধই হয়ে যাবে । শোষণ না থাকায় শোষণ - বিরোধী সেন্টিমেন্ট থাকবে না আর শোষণ - বিরোধী সেন্টিমেন্ট না থাকায় তার ভিত্তিতে গড়ে ওটা নেশন বা নেশনগোষ্ঠীও থাকবে না । তখন কী হবে ? তখন একই আধ্যাত্মিক ঐক্য, একই আধ্যাত্মিক অধিকার ও একই আধ্যাত্মিক আদর্শ মানুষকে এক করে রাখবে । সেই

আধ্যাত্মিক সেন্টিমেন্টের সাহায্যে কোন দেশ বিশেষে নেশন গড়ে উঠবে না সত্য কিন্তু এই সেন্টিমেন্ট সমগ্র গক্ষত্র জগৎকে , সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে এক নেশনে পরিণত করবে । তখন গড়ে উঠবে একটিমাত্র রাষ্ট্র – একটি বিশ্বরাষ্ট্র ।

মানুষ পৃথিবীর যে দেশেরই বাসিন্দা হোক না কেন , আজ তাকে একদিকে যেমন শোষণ - বিরোধী সেন্টিমেন্ট প্রচার করে নিজ নিজ দেশে মজবুত নেশন গড়ে তুলতে হবে , অন্য দিকে তেমনি একটা আধ্যাত্মিক অধিকার অর্থাৎ “ প্রতিটি জীবই একই পরম পিতার সন্তান ” এই তত্ত্ব প্রচার করে সকল নেশনের সকল

মানুষ যে এক বিশ্ব - পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একথা সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে । সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে নেশন থাকলে নেশনে নেশনে স্বার্তসংঘাতও থাকবে । লোক মুখে নিরস্ত্রীকরণের কথা বললেও তলে তলে সামরিক প্রস্তুতি চালিয়ে যাবে আর বিশ্ব - মানবের কল্যাণ প্রচেষ্টায় রত হলে প্রকারান্তরে তার নেশনেরও কল্যাণ হবে কারণ তার নেশন তো আর বিশ্ব ছাড়া নয় ! একটা আধ্যাত্মিক

অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা আধ্যাত্মিক আদর্শেরও প্রচার করতে হবে । আর সেই আদর্শ বা সেন্টিমেন্টই হচ্ছে – এক পরমপুরুষই হচ্ছেন সকলের জীবনের ধ্রুবতারা । এই আধ্যাত্মিক সেন্টিমেন্টই চিরদিনের জন্যে সকল মানুষকে এক করে রাখবে । “ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় । ”

[পিছনের মলাটের লেখা]

“রাজনীতি আমার ব্যবসাও নয়, পেশাও নয়। আমি ইতিহাসের এক সাধারণ ছাত্রমাত্র। ভারতবর্ষের যে ভয়াবহ চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে আসছে মুখ ফুটে তা' প্রকাশ করা আমার কর্তব্য বলে মনে করছি, যাতে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা আমাকে দোষ না দেন। যাঁরা দেশনেতা এ ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব সর্বাধিক। তাঁরা দেশকে ডোবাতেও পারেন, বাঁচাতেও পারেন। মুখে যাই বলা হোক না কেন, আসলে সরকারী বা বেসরকারী, রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক সকল সংস্থারই নীতি নির্ধারণ করে থাকেন মুষ্টিমেয় দু'চার জন। তাঁরাই

সেই সংস্থার নেতা। বর্ত্তমানে যাঁরা নেতা তাঁদের তাই ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্যে, ভারতবর্ষকে একটি মজবুৎ নেশন বা নেশন–গোষ্ঠীতে পরিণত করবার জন্যে অবিলম্বে একটা বলিষ্ঠ নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন টালবাহানা বা কোন কথার মারপ্যাচের ফল দেশের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হবে”

· শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

সমাপ্ত

****************X****************

ঘোষণা

আধ্যাত্মিক সাধনা তথা পথনির্দেশনা লাভ করার সুযোগ ও অধিকার নারী–পুরুষ, জাতপাত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই সমান হওয়া উচিত। এই সাধনা বিজ্ঞান পরমার্থের সন্ধান দেয় । যা পরমার্থের সন্ধান দেয় তা কখনোই অর্থকারী ব্যবসায় লাগানো উচিত না । আনন্দমার্গের সন্ন্যাসী / সন্ন্যাসীনীদের কাছ থেকে যে কোন মানুষ এই সাধনা বিজ্ঞান বিনামূল্যে অনায়াসে শিখতে পারেন।

সাধনা হলো মানস-আধ্যাত্মিক অনুশীলন। বেয়াম হল শারীরিক অনুশীলন । যদি কেউ ব্যায়াম শিখে তা নিয়মিত অনুশীলন না করে তবে তার কিছুই লাভ হয় না । ঠিক তেমনি কেউ যদি সাধনা শিখে তা নিয়মিত অনুশীলন না করে তাহলে তার সাধনা শিখাতে কোন লাভ হয় না ।

মানব জীবনের চরম লক্ষ্য হ'ল পরমানন্দ লাভ করা। একমাত্র সাধনার দ্বারাই ব্রহ্মোপলব্ধির মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।